ইসলামী খিলাফত সরকারের শিল্পায়নের মডেল

১. শিল্পায়ন বলতে কী বোঝায়?

আজকের মুসলিম বিশ্ব শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে অবশ্যই অনেকদূর পিছিয়ে। যদিও পশ্চিমা দেশগুলো এখন থেকে দেড়শ-দুইশ বছর আগেই শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে কিন্তু মুসলিম দেশগুলো এখনও প্রায় প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে এবং অনেকাংশেই উন্নত দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল থেকে গেছে। তবে আলোচনার শুরুতে শিল্পায়ন তথা শিল্পোন্নত অর্থনীতি বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা যাক। বাস্তবে যখন কোন অর্থনীতি ম্যানুফ্যাকচারিংকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং ম্যানুফ্যাকচারিংই অর্থনীতির অন্য সেক্টরগুলোর চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে, তখন সেই অর্থনীতিকে আমরা শিল্পোন্নত অর্থনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। আর ম্যানুফ্যাকচারিং বলতে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাতকরণ করে ব্যবহার্য পণ্যে পরিণত করা বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের কথা বলতে পারি। ম্যানুফ্যাকচারিং ছিল তার অর্থনীতির মূল বিষয়। জাহাজ নির্মাণ, গোলাবারুদ উৎপাদন, খনিজ আহরণে তাদের দক্ষতা তাদেরকে পরাশক্তিতে পরিণত করেছিল। অর্থনীতির এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা সহজেই যে কোন স্থানে যুদ্ধ সূচনা এবং উপনিবেশ স্থাপন করতে পারতো। শান্তিকালীন সময়ে এসব শিল্পকারখানা বেসামরিক কাজে ব্যবহৃত হতো।

একটি জাতি যখন বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করে এবং তার শিল্পভিত্তি মজবুত থাকে তখনই সেই জাতি স্বনির্ভর হয় এবং অন্য জাতির নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু শিল্পায়ন না ঘটলে একটি জাতিকে প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষার মত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতেও অন্য জাতির উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। আর এই অবাঞ্ছিত বাস্তবতাতেই আজকের মুসলিম বিশ্ব নিমজ্জিত।

২. কেন মুসলিম বিশ্বে শিল্পের প্রসার ঘটেনি?

যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকই মুসলিম বিশ্বের বর্তমান বাস্তবতায় হতাশ এবং অবাক হবেন। কেননা বিশাল খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার নিয়েও এই দেশগুলো দরিদ্র এবং শিল্পের প্রসার ঘটাতে দারুনভাবে ব্যর্থ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইরাক একাই পৃথিবীর মোট তেল রিজার্ভের ১০% এর অধিকারী। তেমনিভাবে ক্ষুদ্র কুয়েতও পৃথিবীর

মোট তেলের ১০ শতাংশের মালিক। মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ মুসলিম বিশ্বের মানচিত্রের সর্বত্র একই দশা। সব জায়গাতেই চোখে পড়বে অব্যবস্থাপনা ও ভ্রান্তনীতির শত-সহস্র উদাহরণ।

সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং নীতি না থাকায় – মুসলিম দেশগুলোর শাসকরা সব সময়ই অদূরদর্শী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যস্ত। আর এ ধরণের প্রবণতা শুরু হয়েছে সেই ১৯২৪ সালে খিলাফত ধ্বংসের সময় থেকেই।

তুরস্কের মধ্যে যে সম্ভবনা ছিল তা বিকশিত হয়নি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর বিতর্কিত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নীতি বাস্তবায়নের কারণে। তেমনি পাকিস্তানও এমনভাবে বিশ্বব্যাংকের নীতিকে বাস্তবায়ন করছে, যার ফলাফল হলো পাকিস্তান টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি করছে ঠিকই কিন্তু তার শিল্পভিত্তি গড়ে উঠছে না। একই ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশেও। আরব দেশগুলিও পণ্য উৎপাদনের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ কারখানা গড়ে তুলতে পারেনি। এমনকি তেল উৎপাদনের জন্য যেসব স্থাপনা গড়ে উঠেছে সেগুলোও মূলত পশ্চিমা তেল কোম্পানিগুলোরই অবদান। আর পুঁজিবাদী এই কোম্পানিগুলো এ কাজটি করেছে মূলত অপরিশোধিত তেল উৎপাদন এবং তা রিফাইনিং এর ক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য। এছাড়া তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোকে রাজনৈতিকভাবে বশে রাখাটাও তাদের এ সেক্টরে বিনিয়োগ করার অন্যতম উদ্দেশ্য। ২০০৬ সালে মধ্যপ্রাচ্য পৃথিবীর মোট অপরিশোধিত তেলের ৩১.২ শতাংশ উৎপাদন করে। কিন্তু এ সময় তারা মাত্র ৩.২ শতাংশ তেল পরিশোধন করতে সক্ষম হয়। ইন্দোনেশিয়া পুরো ৮০ এবং ৯০ দশক জুড়ে অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতি বাস্তবায়ন করে এবং বিদেশী বিনিয়োগের জন্য সবকিছু উন্মুক্ত করে দেয়। কিন্তু তার ফল দাঁড়ায় ১৯৯৭ এর এশিয়া সংকট যা ইন্দোনেশিয়া এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আজ ইন্দোনেশিয়া ১৪০ বিলিয়ন ডলার ঋণের জালে বন্দী।

মুসলিম দেশগুলো রাষ্ট্রীয় জীবনে যে সব নীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তার বেশিরভাগই পরস্পরবিরোধী, যার কারণে রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে জনগণের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করা কোনভাবেই সম্ভব হয়ে উঠছে না। অর্থনৈতিক টানাপোড়ন এখানে এত প্রকট যে জনগণ শুধুমাত্র রুটি-রুজির ধান্ধা করতে গিয়েই দিন পার করে ফেলে; রাষ্ট্রকে পরাশক্তিতে পরিণত করার জন্য কাজ করার সময় তাদের হয়ে ওঠেনা। এজন্য কেউ যদি মুসলিম দেশগুলোকে শক্তিশালী তথা শিল্পোন্নত করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই জনগণকে তার (শিল্পোন্নয়নের) প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে হবে এবং এজন্য যে যে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হবে সে ব্যাপারে জনগণকে রাজী করাতে হবে।

২য় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ভোগ্যপণ্য বিপননের অর্থনীতিকে পাশে সরিয়ে রেখে সমরাস্ত্র উৎপাদন ভিত্তিক শিল্পের প্রসার ঘটানোর নীতিতে মার্কিন জনগণের সহযোগিতা এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

সে সময়কার মার্কিন সরকার যুদ্ধ জাহাজ ও এরোপ্লেন নির্মাণ এবং সমরাস্ত্র উদ্ভাবন ও উৎপাদনের জন্য বিশাল বাজেট বরাদ্দ করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করা। যুদ্ধকেন্দ্রিক এই শিল্পায়ন দ্রুত মার্কিন অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করলো। রাতারাতি বেকারত্ব কমে গেলো। ১৯৪১ এর ডিসেম্বরে যখন আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জড়িত হলো, তখন অর্থনীতির প্রত্যেকটি সেক্টর যুদ্ধের যোগান দিতে সক্ষম হলো। সে সময় এত দ্রুত শিল্প প্রবৃদ্ধি ঘটলো যে আমেরিকাতে বেকারত্বের বদলে শ্রমিক সংকট দেখা দিলো। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনগণ ও শিল্পকে ক্রমাগত উৎসাহ দেয়ার ব্যাপারটিও সমান তালে চলতে থাকলো। ফলে ত্রিশ দশকের শেষাংশে মার্কিন ওয়ার ইন্ডাষ্ট্রি ৩ লক্ষ এরোপ্লেন, ৫ হাজার কার্গো জাহাজ, ৬০ হাজার ল্যান্ডিং ক্র্যাফট এবং ৮৬ হাজার ট্যাঙ্ক তৈরী করে ফেলল। অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় মার্কিন অর্থনীতিতে নারী শ্রম সবচেয়ে বেশি পরিমাণে নিয়োজিত হলো।

যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরীতে মার্কিন সরকারের এই বিশাল কর্মকান্ডের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলো মার্কিন ব্যবসায়ীরা। দশক ধরে চলমান মন্দাকে উপেক্ষা করে তারা বড় বড় বিনিয়োগ করলো। ফলে বিশাল শ্রমবাজার সৃষ্টি হলো। জনগণ, পুঁজিপতি শ্রেণী এবং রাষ্ট্র সবাই একসাথে কাজ করে যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে লাগলো। এই প্রথমবারের মত মার্কিন জনগণ রেশনিং ব্যবস্থা মেনে নিলো। যুদ্ধ অর্থনীতির একটি স্বাভাবিক নিয়ম হলো এখানে খরচ নয় বরং দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। ফলে কম সময়ে অনেক বেশী শ্রমের প্রয়োজন হয়। মার্কিন অর্থনীতিতেও তাই হয়েছিল, এমনকি রাস্তার ভিক্ষুক পর্যন্ত চাকরির বাজারে লাইন দিয়েছিল। সামরিক বাহিনীতে নিয়োজিত হয়েছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ সক্ষম মানুষ। তাদের অনেকেই এর আগে বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত ছিলো; তাদের শূণ্যস্থান পূরণের জন্যও নতুন শ্রমিকের প্রয়োজন পড়লো। ওয়ার ইন্ডাষ্ট্রির টানে কৃষি, খনিজ উত্তোলণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি সব জায়গায় নবগতির সঞ্চার হলো। যোগাযোগ ব্যবস্থায় রাতারাতি বিপ্লব সাধিত হলো, শ্রম বাজার ও সামগ্রিক বিপনন ব্যবস্থাও প্রভূত উন্নতি সাধন করলো। শিল্পে ও বাণিজ্যে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গনকে দ্রুত বিকশিত হতে হলো।

এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সেরা বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের চিন্তা-গবেষণাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছিল। মার্কিন সরকার বুঝতে পেরেছিল তারা যদি পারমানবিক বিক্রিয়ার সূত্রকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র উদ্ভাবনে সক্ষম হয় তাহলে তা তাদেরকে কৌশলগত প্রাধান্য এনে দিতে পারবে। পরাশক্তিগুলোর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রতিযোগিতার এ পর্যায়েই ঐতিহাসিক 'ম্যানহাটন' প্রকল্পের জন্ম হলো।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান ব্যর্থতা দিয়ে বোঝা যায় প্রাকৃতিক সম্পদের কী পর্যায়ের অব্যবস্থাপনা এখানে চলছে। আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক দূরবস্থা মূলতঃ দুটি কারণে সৃষ্ট; প্রথমত: শাসকদের আদর্শিক শূণ্যতা, দ্বিতীয়ত: আদর্শিক শূণ্যতার ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক অদূরদর্শীতা।

যতদিন পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে এ দু'টি বিষয়ে পরিবর্তন না ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত যত সম্পদই থাকুক না কেন আমরা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয়ভাবেই পশ্চিমা শক্তিগুলোর আধিপত্যের শিকার হতে থাকবো। কোন শক্তিশালী আদর্শিক ভিত্তি না থাকলে কিসের উপর আমরা আমাদের অর্থনীতিকে গড়ে তুলবো? যখন কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শিক ভিত অনুপস্থিত থাকে, তখন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় যেসব নীতি ও কৌশল গ্রহণ করা হয় তা পরস্পর সাংঘর্ষিক হতে বাধ্য এবং এমতাবস্থায় কোন সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে অর্থনীতিকে পরিচালনা করা কখনই সম্ভব নয়।

৩. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্প-কারখানার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিঃ

মুসলিম হিসেবে আমরা প্রতিটি বিষয় কুরআন ও সুন্নাহ্'র আলোকে দেখতে বাধ্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপারেও একই কথা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে যে, খেজুর গাছের কলম করা বিষয়ক কৃষি প্রযুক্তির ব্যাপারে তিনি (সাঃ) বলেছেন, **"তোমাদের দৈনন্দিন জীবনের এসব বিষয় তোমরাই ভাল জান।" [আহমদ]**

এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি (সাঃ) দু'জন সাহাবীকে (রা.) যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ প্রযুক্তি শিখে আসার জন্য ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন।

এরই প্রেক্ষিতে, মুসলিম উম্মাহ্ সব সময়ই এ বিষয়ে সচেতন ছিল যে, দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির (যেমনঃ ইবাদত, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি) ক্ষেত্রে তারা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে সমাধান নিতে বাধ্য। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে স্বীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের কার্যরীতি আবিষ্কার করার অনুমতি দিয়েছেন, এমনকি উৎসাহিত করেছেন। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ্র কাছে কখনোই ওহীলব্ধ জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সাংঘর্ষিক মনে হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) এর শাসনকালে তথা ইসলামের প্রাথমিক যুগেই নৌপ্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ঘটানো হয়েছিল।

উপরন্তু, ইসলামী শাসনব্যবস্থা তথা খিলাফত যুগের বৈজ্ঞানিকরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকেই মহাবিশ্ব সম্পর্কে গবেষণা করার ব্যাপারে উৎসাহ ও দিক নির্দেশনা পেতেন। যেমন, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ
بَّنَا مَا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَ
ا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِخَلَقْتَ هَذ

"নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাত্রির আবর্তনে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্'কে স্বরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বলে, 'হে আমাদের প্রভূ! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি। গৌরব তোমার জন্যই! আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর'।" [সূরা আলি ইমরান : ১৯০-১৯১]

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاس

"এবং আমি সৃষ্টি করেছি লোহা, যাতে রয়েছে বিপুল শক্তি, এবং সেই সাথে মানবজাতির জন্য নানা উপকার।" [সূরা হাদীদ : ২৫]

অতএব, মহাবিশ্বের বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সৃষ্টি কৌশলকেই প্রকাশ করে এবং এ বিষয়ে চিন্তা তার নিকটবর্তী হবার সহায়ক।

যখন পৃথিবীতে ইসলাম রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত ছিল, তখন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে পারস্য, গ্রীক, ভারত ও অন্যান্য প্রাচীন জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বই অনুবাদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল। আব্বাসী খিলাফতের শাসনকালে (বিশেষত খলীফা আল মনসুর ও আল মামুনের সময়ে) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদের বিপুল উদ্যোগ নেয়া হয়।

ইসলামী শাসনকালে মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের আবিষ্কারগুলোকে কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছিলো। তারা তাদের চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের গুণগত ও পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হন। বস্তুতঃ যে কোন জাতির শিল্পায়ন তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। দীর্ঘ সময়ের ইসলামী শাসনকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে মুসলিমদের অসংখ্য অবদানের অল্প কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ১২শ শতকে আল-জাজারি ক্র্যাংকশ্যাফট আবিষ্কার করে এতে রড ও সিলিন্ডার এর মাধ্যমে ঘূর্ণন তৈরি করেন। এটাই আজকের আধুনিক ইঞ্জিনের আদিরূপ যা সকল গাড়ি ও শিল্পকারখানার মূল চালিকাশক্তি।

- দশম শতাব্দিতে আল বেরুনী গীয়ার চাকা ব্যবহার করে যান্ত্রিক সৌর ও চান্দ্র পঞ্জিকা নির্মাণ করেন। যার ভিত্তিতে পরবর্তীতে পনের শতকে আরেক মুসলিম বিজ্ঞানী তাকিউদ্দিন যান্ত্রিক ঘড়ি নির্মাণ করেন। ইবনে ইউনুস সময় পরিমাপের জন্য পেন্ডুলামের ব্যবহার দেখিয়েছিলেন।

- সকল ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির প্রাণ যে কেমিস্ট্রি বা রসায়ন শাস্ত্র তার জনক এককভাবে মুসলিমরা। জাবের ইবনে হাইয়ান বিভিন্ন Chemical research এর মাধ্যমে বিভিন্ন পদার্থের বৈশিষ্ট্যের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। ধাতু নিষ্কাশন, অজৈব এসিড ও ক্ষারীয় পদার্থের ধারণা – এ সব শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদানের কয়েকটি মাত্র, যা আধুনিক ধাতব শিল্পের ভিত্তিস্বরূপ।

- আল হাজেন অপটিকেল সাইন্সের জনক এবং আধুনিক লেন্সের আবিষ্কারক। এছাড়া কাগজ, বায়ুকল (Windmill), মেটালার্জি, কেমিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রাথমিক ধারণাসমূহ মুসলমানদের হাতেই বিকশিত হয়।

- ইবনে খুরদাদবেহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করেন। আল বেরুনী বিভিন্ন বস্তুর বিশেষ মাধ্যাকর্ষণ (Specific gravity) পরিমাপ করেন। মুসলিম বিজ্ঞানীরা নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে এর ভিত্তিতে 'আকাশ মানচিত্র' প্রস্তুত করেছিলেন। তাদের আবিষ্কৃত কম্পাস ও এ মানচিত্র সমুদ্রে নৌ চলাচলের কাজে লাগতো।

- মুসলিম বিজ্ঞানীরাই প্রথম বীজগণিতকে গণিতের স্থায়ী শাখায় পরিণত করেন। এলজেবরা শব্দটির উৎপত্তিই হচ্ছে আরবী শব্দ 'জবর' থেকে।

- ঔষধশিল্পেও মুসলিমদের দীর্ঘস্থায়ী অবদান ও প্রভাব ছিল। ইবনে সিনা হৃদরোগের উপর গ্রন্থ রচনা করেন এবং 'কানুন' নামক তার বিখ্যাত গ্রন্থে বিভিন্ন রোগ ও অজস্র ঔষধের বিবরণ দেন। উমাইয়া খিলাফতের শাসনকালে মুসলিমরা বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল গড়ে তুলে। খলীফা হারুন উর রশিদের সময় বাগদাদ নগরীতে ইতিহাসের সর্বপ্রথম হাসপাতালটি নির্মিত হয়। এর পরপরই আরো বেশ কিছু হাসপাতাল গড়ে উঠে। এসবের কোন কোনটির ছিলো নিজস্ব বাগান যাতে ঔষধী গাছসমূহের বিশাল সংগ্রহ থাকতো। বড় বড় হাসপাতালগুলোর সাথে মেডিকেল কলেজও গড়ে ওঠেছিলো।

- সমরাস্ত্র প্রযুক্তি ও শিল্পেও মুসলিমরা বিপ্লব তৈরি করেছিল। 'আল ফুরুসিয়া ওয়াল মানাসিব উল হারাবিয়া' সমরাস্ত্র বিষয়ে লিখিত বিশ্বের প্রথম গ্রন্থ যা মুসলিমদের হাতে রচিত। হিজরী প্রথম শতকেই মুসলিমরা যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করে যার আরবি নাম 'দারুস সানাআ'। ফরাসি 'দারসিন' ও ইংরেজী 'আরসেনাল' শব্দের উৎপত্তি এখান থেকেই। খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের সময় তিউনিসে তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ রণতরী নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুসলিমরাই সর্বপ্রথম জাহাজ শিল্পের উন্নয়নে নৌ দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে যাকে বলা হতো 'দীওয়ানুল উস্তল'। এর অধীনে বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররা থাকতো।

এসব হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত জিনিসগুলোর মধ্যে কয়েকটি মাত্র। এসব অবদান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরবর্তীকালের অগ্রগতিতে অনবদ্য অবদান রেখেছিলো।

মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পশ্চাদপসরণতা শুরু হয় তখন থেকে যখন মুসলিমরা ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে এবং এর বাস্তবায়নের ব্যাপারে অবহেলা শুরু করে। এর ফলে, ইসলামী জ্ঞানের চর্চা কমে যায়, ইজতিহাদ তথা নব উদ্ভাবিত বিষয়ে ইসলামের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য কর্তৃক মিশনারী, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এসব বিষয় কার্যকরভাবেই ইসলামী রাষ্ট্রের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয় এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে ইসলামী রাষ্ট্র ইউরোপের আগ্রাসন থেকে নিজেকে রক্ষা করার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং খিলাফত ধ্বংস হয়ে যায়।

কোন জাতিই উন্নতি করতে পারেনা, সেটা প্রযুক্তগত উন্নয়ন হোক বা অন্য উন্নয়ন হোক, যদি না তারা বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দানকারী কোন জীবন বিধান ও ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ না করে। মুসলিমরাও এই নিয়মের বাইরে নয়। মুসলিম উম্মাহ্‌র অগ্রগতির জন্য আমাদেরকে প্রথমে ইসলাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুনরায় উঠে দাঁড়াতে হবে, যাতে করে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার (ইবাদত, শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি ইত্যাদি) অধিকারী হতে পারি এবং এরপরই আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রগতি মুলতঃ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি, তার প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি এবং শেষ বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। তাই ইসলাম বাস্তাবায়ন ছাড়া এই উম্মাহ্‌র উদ্ভাবনী শক্তিকে পুনরায় জাগিয়ে তোলার আর কোন উপায় নেই।

৪. নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে খিলাফতের শিল্পায়ন নীতি সাজানো হবেঃ

৪.১ রাজনৈতিক আকাংখা

মুসলিম বিশ্ব শিল্পায়নের দিক থেকে পশ্চাৎপদ থাকার একটি মূল কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আকাংখার অনুপস্থিতি। মুসলিম শাসকরা এতদিন আমাদের দেশগুলোকে শুধুমাত্র পশ্চিমা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বাজারে পরিণত করার নীতি বাস্তবায়ন করেছে। তথাকথিত মুক্তবাজার ও মুক্তবাণিজ্যের ধারণা সব সময়ই আমাদের দেশগুলোর শিল্প কারখানা ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। শিল্প কারখানা বলতে যা অবশিষ্ট আছে সেগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে মূলতঃ পশ্চিমাদের ভোগের সামগ্রীর সরবরাহ কেন্দ্র হিসেবে। সার্বিক আদর্শিক শূণ্যতার মাঝেও যখনই কোন মুসলিম রাষ্ট্র রাজনৈতিক

পরিকল্পনাকে সম্পৃক্ত করে শিল্প স্থাপন করেছে, তখনই তারা সরাসরি লাভবান হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পাকিস্তান আঞ্চলিক রাজনীতিতে টিকে থাকতে গিয়ে পারমানবিক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল এবং অবশেষে সে পারমানবিক শক্তির অধিকারী হতেও সক্ষম হয়েছে; মিশরও ৫০ এর দশকে অনুরূপ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল কিন্তু ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের কাছে পরাজিত হওয়ার পর দেশটি তার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে।

যখন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন মুসলিমদের রাজনৈতিক আকাংখাই তাদের প্রযুক্তি ও শিল্পায়নকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কাফের রোমানদের উপর মুদ্রাবিষয়ক নির্ভরশীলতা অতিক্রম করার জন্য ৭৪ হিজরীতে খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান মুসলিম বিশ্বে মুদ্রা ঢালাই ও টাকসাল নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। রোমানদের উপর ইসলামকে বিজয়ী করার উচ্চাশা থেকেই ৩৩ হিজরীতে মুসলিম নৌ বাহিনী নিজেদের নির্মিত ৫০০টি রণতরী নিয়ে সাইপ্রাস দ্বীপ জয় করে। অনুরূপে, ভূ-রাজনীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভূ-মধ্যসাগরের নিয়ন্ত্রণভার নিজেদের হাতে রেখে ইউরোপের বুকে ইসলামকে বিজয়ী করার উচ্চাকাংখা থেকেই খিলাফত যুগে মুসলিম নৌবহরকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবহরে পরিণত করা হয়েছিল এবং এর শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভূ-মধ্যসাগরের তীরবর্তী মুসলিম ভূমিগুলোতে অসংখ্য জাহাজ নির্মাণ কারাখানা গড়ে তোলা হয়েছিল। গত ১৭ শতক পর্যন্ত ওসমানীয় খিলাফতের অধীনে মুসলিম নৌবাহিনী একচ্ছত্রভাবে ভূ-মধ্যসাগর নিয়ন্ত্রণ করতো।

খিলাফত যখন আবার প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে অভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষ্য ও আকাংখার ভিত্তিতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে একতাবদ্ধ করা। যখন খিলাফত রাষ্ট্রের জনগণ একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যের ব্যাপারে একমত হবে তখন তারা সবাই সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে থাকবে। এক সময় মুসলিমদের বাকী ভূ-খন্ডগুলোও এ ব্যাপারে একমত হবে এবং তারাও খিলাফতের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য অগ্রসর হবে। বর্তমানে বিদ্যমান পরিকল্পনাহীনতা থেকে খিলাফত উম্মাহ্‌কে বের করে আনবে এবং সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সকল দক্ষ ও অভিজ্ঞ নাগরিককে একতাবদ্ধ করবে।

বৃহত্তর জনগণের আস্থা সৃষ্টির জন্য যা সবচেয়ে কার্যকর তা হলো যথাযথ সামরিক সক্ষমতা। নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা এবং শত্রুকে পরাজিত করার জন্য একটি বৃহৎ ও অত্যাধুনিক সামরিক বাহিনীর কোন বিকল্প নেই। এ ধরণের একটি সামরিক শক্তির আকাঙ্খা, যা এই মুহূর্তে মুসলিম বিশ্বে অনুপস্থিত, স্বাভাবিকভাবেই খিলাফতকে দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকে ধাবিত করবে যার জন্য প্রয়োজন হবে ব্যাপক শিল্পায়ন। আর শিল্পায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে কারিগরি দক্ষতা আর কাঁচামালের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ। এ দু'টি পূর্বশর্ত কিভাবে পূরণ হবে সে জন্যও আমাদের যথাযথ নীতি ও কৌশল থাকতে হবে।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ। কমিউনিষ্টরা ক্ষমতায় আসার পর ১৯২৮ সালে ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যার উদ্দেশ্য ছিল দেশে ভারী শিল্পের শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলা। সে সময় গৃহীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছিল কতগুলো অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রার সমষ্টি মাত্র। ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ এর মাঝামাঝি ইউএসএসআর -এর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য এসব লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছিল, যে সকল পদক্ষেপগুলোর মধ্য দিয়ে জাতিটি শিল্প ও সামরিক দিক থেকে স্বনির্ভর হতে চেয়েছিল। সেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতির পদ্ধতিগত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে ভারি শিল্পের দিকে ধাবিত হওয়া, তথা ভারি শিল্পের মাধ্যমে আদিম কৃষিভিত্তিক জাতি থেকে শিল্পোন্নত ও সামরিক দিক থেকে একটি শক্তিশালী জাতিতে রূপান্তরিত হওয়া। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্টালিন তার শাসনামলে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ও সম্পদকে কয়লা, লোহা, স্টিল ও রেলওয়ের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উৎপাদনে নিয়োগ করেছিলেন। ম্যাগনিটোগোর্সকের মতো ইউরালের অন্তর্গত নতুন নতুন শহরগুলোতে উৎসাহী তরুণ কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর চেষ্টাও চালানো হয়েছিল।

৪.২ প্রতিরক্ষা কেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা:

কোন অর্থনীতি যে সেক্টরে বেশি গুরুত্ব দেয় তার ভিত্তিতেই সে অর্থনীতির চরিত্র নির্ধারিত হয়। সেই সেক্টরটিই অন্যান্য সেক্টরের জন্য চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৮০র দশক পর্যন্ত বৃটেনের অর্থনীতি ছিল মূলতঃ ম্যানুফ্যাকচারিং কেন্দ্রিক। কিন্তু ৮০র দশক থেকে সেখানে সেবাখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে বৃটেনের অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিদ্যুৎ, পানি, পয়ঃনিস্কাশন, টেলিকম্যুনিকেশন, তথ্যপ্রযুক্তি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, এন্টারটেইনমেন্ট ইত্যাদি সেবাখাতকে ঘিরে আবর্তিত। এসব সেবাখাতের প্রয়োজনেই অন্যান্য অর্থনৈতিক সেক্টর নিজেকে গড়ে তুলছে।

খিলাফতের অর্থনীতি হবে প্রতিরক্ষাশিল্প কেন্দ্রিক অর্থনীতি। উন্নত প্রতিরক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা ও তার ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি ও আধুনিকায়নই হবে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। এ ধরণের অর্থনীতি যে শুধুমাত্র কর্মসংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টি করবে তা নয় বরং বৈরী পরাশক্তিগুলোর আগ্রাসী পরিকল্পনা থেকেও খিলাফতকে রক্ষা করবে। প্রতিরক্ষা কেন্দ্রিক অর্থনীতির অপরিহার্য করণীয় হলো সমরাস্ত্র তৈরীর কারখানার পাশাপাশি সহায়ক শিল্প (Support industry) হিসেবে স্টীল, লোহা, কয়লা, যানবাহন নির্মাণ, খনিজ উত্তোলন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি শিল্প গড়ে তোলা।

রাষ্ট্রকে শিল্পোন্নত করতে হলে আরেকটি বিষয় প্রয়োজন আর তা হলো এমন একটি ফোরাম গড়ে তোলা যারা সুনির্দিষ্টভাবে শিল্পপতিদেরকে নিয়ে কাজ করবে এবং সব সময় তাদেরকে উৎসাহ যোগাবে। ভারী শিল্পের প্রয়োজনে সহায়ক শিল্প (Support Industry) গড়ে তোলার কাজটি অনেকাংশেই শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে করতে হবে এবং

এক্ষেত্রে তাদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করার সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় নীতি থাকবে। দরকার হলে লোহা, কেমিক্যাল ইত্যাদি শিল্পের জন্য উদ্যোক্তাদেরকে বিনামূল্যে সরকারী জমি বরাদ্দ দেয়া হবে। খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও অন্যান্য কেমিক্যাল নিষ্কাশনের জন্য যৌথ বিনিয়োগের নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে; যেসব শিল্প রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তায় সরাসরি অংশগ্রহণ করছে তাদের ক্ষেত্রে কর রেয়াত ও ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

১৯৫২ সালে যখন জাপানে মার্কিন দখলদারিত্বের অবসান ঘটলো তখন জাপান ঠিক এ ধরণের নীতি গ্রহণ করেছিল। উত্তর কোরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া কমিউনিজমের হুমকি মোকাবেলায় জাপান তখন তার সেরা ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের কাজে লাগায়। আর স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে তারা মার্কিনীদের কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত সহায়তা পেয়েছিল।

শিল্পবিকাশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য তখনকার জাপান সরকার অংশীদারী ব্যবসার শর্তসমূহ শিথিল করে এবং বড় বড় ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট গড়ে তোলার অনুমোদন দেয়। সে সময় যে সব বিজনেস হাউসের জন্ম হয়েছিল এখনও তারা জাপানের অর্থনীতির নেতৃত্ব দিচ্ছে। বড় বড় শিল্পপতিরা তখন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে বুঝেছিল যে, রাষ্ট্রের নীতি অনুযায়ী বিনিয়োগ করলে তারা স্বল্প সময়েই বড় পুঁজি সৃষ্টি করতে পারবে। এদিকে মার্কিনীরাও সে সময় জাপানের কাছ থেকে সামরিক রসদ কেনা শুরু করে, ফলে বিশ্ব বাজারে জাপানী পণ্যের বিশাল চাহিদা সৃষ্টি হয়। শিল্প স্থাপনের এই কর্মযজ্ঞের কারণে অর্থনীতিতে সম্পদের প্রবাহ বেড়ে যায় এবং অনেক বিনিয়োগকারী কৃষি এবং টেক্সটাইলের মতো মন্থর প্রকৃতির অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে পুঁজি সরিয়ে এনে অত্যাধুনিক কলকারখানা গড়ে তোলে।

এভাবে উদ্যমী বিনিয়োগকারীদের প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণের ফলে জাপানের মন্থর প্রকৃতির শিল্পসমূহ এক সময় অত্যাধুনিক যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরীর শিল্প দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়। ১৯৭০ সাল নাগাদ জাপানের শিল্পপণ্যের তালিকার প্রথম দিকে স্থান করে নেয় রঙিন টিভি, এসি, পেট্রোকেমিক্যালের মতো অনেক উন্নত প্রযুক্তির পণ্য, যার কোন কোনটি এর ২০ বছর আগে জাপানের মানুষ চোখেই দেখেনি।

অনুরূপ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে খিলাফত ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজিকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত করবে এবং প্রধান প্রধান শিল্পপতিদেরকে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট থাকবে। আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে এমনকি আজকের দুঃখজনক বাস্তবতায়ও মুসলিম বিশ্বে ধনাঢ্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর কোন অভাব নেই। রাষ্ট্রের পরিকল্পনার মধ্যে বড় অর্থনৈতিক লাভের সম্ভাবনা দেখলে আমাদের বর্তমান সম্পদশালীরাও কৌশলগত শিল্পে বড় বিনিয়োগে অবশ্যই এগিয়ে আসবে। এছাড়া তাদেরকে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যদি লাভের পাশাপাশি দেশ ও জনগণের কল্যাণের বিষয়টিও বোঝানো যায় তাহলে তাদের উৎসাহ ও উদ্যম নিঃসন্দেহে আরো বৃদ্ধি পাবে।

৪.৩ খনিজ প্রক্রিয়াকরণ

নিজস্ব খনিজ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য ও অন্য জাতির উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে খিলাফত রাষ্ট্র তার খনিজদ্রব্য উত্তোলন, প্রক্রিয়াকরণ ও শোধনাগার তৈরি করবে। যেহেতু কাঁচামাল শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কাঁচামালকে ঘিরে আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকবে পরনির্ভরশীলতা কমানো।

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী একটি দেশ পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সম্পদ হলো – তেল, গ্যাস, সোনা, ক্রোমিয়াম, লোহা, কয়লা, বক্সাইট, কপার, এন্টিমনি, সালফার, লাইমস্টোন, মার্বেল, বালি, রক-সল্ট এবং সিরামিকের ক্লে বা কাদামাটি। যেহেতু খিলাফত অন্যান্য মুসলিম ভূ-খণ্ডগুলোকেও একীভূত করার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, তাই অন্যান্য দেশের সম্পদগুলোও খিলাফতের আওতায় আসবে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই খিলাফতের আভ্যন্তরীণ সম্পদগুলোর উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণের নীতি বিদেশী কারিগরি দক্ষতার উপর নির্ভশীল রাখা হবে না।

মুসলিমদের বেশিরভাগ সম্পদই প্রক্রিয়াকরণ করা হয় বিদেশী কোম্পানিগুলোকে দিয়ে তথা মার্কিন-বৃটিশ কোম্পানিগুলোকে দিয়ে। উত্তোলনের নামে এসব সম্পদের বেশিরভাগ অংশই এ সকল পশ্চিমা কোম্পানিগুলোকে দিয়ে দেয়া হয়। কখনও কখনও দেশীয় তেল কোম্পানিগুলোকেও বেসরকারিকরণের নামে বিক্রি করে দেয়া হয় ঐসব কোম্পানিগুলোর কাছে।

খনিজ প্রক্রিয়াকরণে স্বনির্ভরশীল হওয়ার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

ক. যে সকল সম্পদ খিলাফতের মধ্যে থাকবে না সেগুলো অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করে আনা হবে। ইদানিং চীনও একই নীতি গ্রহণ করেছে। চীন তার তেলের প্রয়োজন মেটাতে আফ্রিকার দেশগুলোতে তেলের বিনিময়ে প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য সাহায্য প্রদান করে চলেছে। পাশ্চাত্য নীতির অনুসরণেই চীন এখন আফ্রিকায় প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানসহ দরকারী রাস্তা-ঘাট, স্কুল, হাসপাতাল ও অফিস-আদালত গড়ে তুলেছে। সাম্প্রতিক ইন্দো-আফ্রিকান সম্মেলনও এ নীতির একটি সুন্দর উদাহরণ। একই ধরণের নীতি খিলাফত রাষ্ট্রও প্রয়োজনে গ্রহণ করবে, যদিও আল্লাহ্'র রহমতে মুসলিম ভূ-খণ্ডগুলো পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর।

খ. মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান পশ্চিমা কোম্পানিগুলোর ব্যাপারেও খিলাফতকে কিছু নীতি নির্ধারণ করতে হবে। তারা মুসলিম বিশ্বে থাকলে আমাদের কি সুবিধা, আর কি সমস্যা, তা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। বর্তমানে তারা চরম স্বাধীনতা ভোগ করছে; বিশেষ করে খনিজ সম্পদের বিষয়টিতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা শ্রম ও দক্ষতার মজুরি হিসেবে খনিজ সম্পদের অংশীদারিত্ব পেয়ে থাকে, এছাড়া মুসলিম বিশ্বের দুর্নীতিপরায়ণ

শাসকগোষ্ঠী ও অভিজাতশ্রেণী ব্যক্তিগত স্বার্থের বিনিময়ে জনগণের সম্পদ বিদেশীদের হাতে তুলে দিচ্ছে; যার কারণে খনিজ সম্পদের প্রকৃত অধিকারী হয়েও তা থেকে জনগণ তেমন কোন সুবিধা পাচ্ছে না।

গ. সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এসব পশ্চিমা কোম্পানিগুলো কোন দক্ষতা বা প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তর করছে না। খিলাফতের অভ্যন্তরে কোন বিদেশী কোম্পানীকে কাজ করতে হলে অবশ্যই মুসলিমদের সাথে প্রযুক্তি হস্তান্তর চুক্তি করতে হবে। প্রযুক্তি বিনিময়ের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সম্প্রতি একটি ভাল নজির স্থাপন করেছে। সম্প্রতি ফ্রান্স ও পাকিস্তানের মধ্যে সাবমেরিন নির্মাণ ও সরবরাহের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তি বলে ফ্রান্সের কাছ থেকে পাকিস্তান ৩টি সাবমেরিন কিনবে, কিন্তু শর্ত হলো এর একটি নির্মিত হবে ফ্রান্সে আর বাকী দুটি ফ্রান্সের তত্বাবধানে পাকিস্তানের প্রযুক্তিবিদদের হাতে তৈরী হবে। এ ধরণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বলিত নির্মাণ চুক্তি অবশ্যই উন্নত শিল্প বিকাশে সহায়ক হবে।

ঘ. খিলাফত রাষ্ট্র অবশ্যই তার নিজস্ব কারখানার উৎপাদন সক্ষমতা সম্পর্কে গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি রাখবে। যে সব প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি আমাদের নেই তা দ্রুত বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিজেদের সক্ষমতাকে যুগোপযোগী করে রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পাকিস্তানে বর্তমানে চিনি ও সিমেন্ট নির্মাণের প্লান্ট, কৃষি যন্ত্রাংশ উৎপাদন কারখানা, সড়ক নির্মাণের জন্য রোলার তৈরীর কারখানা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও ভারী শিল্পের কারখানা আছে। এসব কারখানাকে সামান্য পরিবর্তন করেই সেখানে ভারী লৌহ ও ইস্পাতজাত সামগ্রী তৈরী করা সম্ভব। এসব লৌহ ও ইস্পাতজাত পণ্য আবার অন্যান্য শিল্প, যেমন গাড়ী নির্মাণ, সমরাস্ত্র নির্মাণ ইত্যাদিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৪ খিলাফত তিনভাবে শিল্পে বিনিয়োগ করবে

- **সরাসরি বিনিয়োগঃ** যে সব শিল্প সাধারণত লাভজনক ভিত্তিতে চালানো সম্ভব নয়, কিন্তু রাষ্ট্রের অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য সেগুলোকে অবশ্যই রাষ্ট্র নিজস্ব বিনিয়োগে স্থাপন করতে ও চালু রাখবে। যেমন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, সাবমেরিন ও যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ, রেলওয়ে ইত্যাদি।

- **যৌথ বিনিয়োগঃ** যেসব ক্ষেত্রে পরবর্তীতে রাষ্ট্র তথা জনগণ লাভবান হবে, অথবা যেসব শিল্প সরকারের অংশগ্রহণ ছাড়া গড়ে উঠতে পারবে না, যেমন তেল উত্তোলন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ইত্যাদিতে রাষ্ট্র ব্যক্তিখাতের সাথে যৌথ বিনিয়োগ করবে।

- **ব্যক্তিখাতের শিল্পে ভর্তুকি বা সুবিধা প্রদানঃ** যারা রাষ্ট্রের চাহিদামতো পণ্য উৎপাদন করবে, যেমন কোন গাড়ি কারখানা যদি সামরিক যান বা ট্যাঙ্ক উৎপাদন করে তবে তাকে যথাযথ আর্থিক সুবিধা দেয়া হবে। যারা অন্যান্য শিল্পের জন্য কাঁচামাল উৎপাদন করে তাদেরকে ভর্তুকি বা ঋণ সুবিধা দেয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ ইন্ডাষ্ট্রি (যেমন অস্ত্র কারখানা ইত্যাদি) স্থাপনকারীদেরকে বিনামূল্যে সরকারী জমি বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

যোগ্য বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করা খিলাফত সরকারের কর্তব্য। মুসলিম মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক পরমানু বিজ্ঞানী এবং পেট্রোলিয়াম বিশেষজ্ঞ তৈরী আছে; কিন্তু রাষ্ট্রের যথাযথ রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় তারা বিদেশে চাকরী খুঁজে নিচ্ছে; যার কারণে মুসলিম বিশ্বে দক্ষ জনশক্তির সংকট ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৬৭ তে যখন মিশর তার পারমানবিক কর্মসূচি বন্ধ ঘোষণা করে তখন সেখানকার বিজ্ঞানীরা সাদ্দাম হোসেনের সামরিক প্রকল্পে যোগ দেয়। পাকিস্তানের পরমানু প্রকল্পের স্থপতি আব্দুল কাদির খাঁন এখন বেকার।

শিল্পায়নের গতি ধারাকে যদি অব্যাহত রাখা যায় তাহলে তা সামগ্রিক অর্থনীতিতে অবশ্যই ব্যাপক গতি সঞ্চার করবে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, যে জন্য শিল্পে এই গতি অর্জন করা যাচ্ছে না তা হলো যথাযথ রাজনৈতিক আকাংখা ও পরিকল্পনার অভাব। মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান অর্থনীতিতে সত্যিকারের কোন চালিকা শক্তি নেই এবং অধিকাংশ ধনী দেশ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ বিক্রির টাকায় ভোগ-বিলাস করছে।

আমরা যদি বিশাল আকারের প্রতিরক্ষা ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলার কাজে হাত দিই, তাহলে ব্যক্তিখাত থেকে অবশ্যই বড় ধরণের বিনিয়োগ আসবে কারণ সরকারের তৈরী করা বড় ধরণের চাহিদা যে সুযোগ সৃষ্টি করবে তাকে কাজে লাগাবে প্রাইভেট সেক্টর। সবার আগে যে ভাল ফলটি দৃশ্যমান হবে তা হলো ব্যাপক কর্মসংস্থান। যদিও মুসলিম বিশ্বে দক্ষ জনবলের অভাব নেই তার পরও হঠাৎ করে শিল্পায়ন ঘটলে আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রশিক্ষণ সুবিধা চালু করতে হতে পারে।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবেই দৈনন্দিন পণ্যের ব্যবহার ও চাহিদা বাড়বে, কেননা অনেক মানুষের হাতে তখন খরচ করার মত টাকা আসবে। পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে অর্থনীতির অন্যান্য সেক্টরেও কাজ ও উৎপাদনশীলতা বাড়বে। নিত্য পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি বিলাসী পণ্যের চাহিদা, ব্যবহার ও উৎপাদন বাড়বে, সেখানে আবার নতুন শিল্প গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত হবে; বাড়বে অর্থনীতিতে সম্পদের প্রবাহ।

৪.৫ কৃষি

একটি টেকসই শিল্পায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। জাতি যাতে খাদ্যের জন্য বিদেশী শক্তির উপর নির্ভরশীল না থাকে এটা নিশ্চিত করা অতীব জরুরী। সকল উন্নয়নই অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি জনগণের মৌলিক খাদ্য নিরাপত্তা না থাকে। তাই খিলাফত সরকার স্রষ্টা প্রদত্ত বিশাল উর্বর ভূমি কৃষি উৎপাদনে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য একটি সুষম নীতি প্রণয়ন করবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্ক শিল্পের পাশাপাশি একটি মোটামুটি শক্তিশালী কৃষিভিত্তি তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮০ সালের পর আইএমএফ এর ধ্বংসাত্মক প্রেসক্রিপশন তার কৃষিখাতকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। তার পরও তুরস্ক এখনও খাদ্যপণ্য, গবাদি পশু এবং পোল্ট্রি রপ্তানীকারক দেশ।

খিলাফতের উচিত হবে কৃষি ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করা। এখানে উল্লেখ্য করার মতো একটি বিষয় হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উত্তর কোরিয়া 'যাচ্ ফিলসফি' নামে একটি সুষম কৃষিনীতি বাস্তবায়ন করে। কমিউনিস্ট চিন্তাধারার অনুসরণে এটি ছিল একটি তিন স্তরের কর্মসূচী। উত্তর কোরিয়া এখন তার কৃষি সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি অন্যান্য দেশে রপ্তানি করতে আগ্রহী কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শর্তের কারণে তা এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। আগামী দিনে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে উত্তর কোরিয়ার সাথে কৃষি উন্নয়ন চুক্তি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে খিলাফত নিশ্চয়ই এমন বাণিজ্য সমঝোতায় পৌঁছবে যাতে করে আমরা তাদের কৃষি প্রযুক্তি ও কৌশল থেকে লাভবান হতে পারি।

৫. উপসংহার

এ নিবন্ধে যে আলোচনা হল তা মূলতঃ মোটাদাগের নীতি ও কৌশল। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে সব ভূমি খিলাফতের অন্তর্ভূক্ত থাকবে সেগুলোর বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই আসল কৌশল স্থির করতে হবে। আজকের মুসলিম বিশ্ব সম্পদ, দক্ষতা ও জনশক্তিতে সমৃদ্ধ। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের এই দক্ষ জনগোষ্ঠীই খিলাফতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করবে।

আমাদের বর্তমান শাসকরা পশ্চিমা উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর এজেন্ট। এরা কখনোই রাষ্ট্রের সামর্থ ও সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাবে না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জার্মানি দ্রুত শিল্পায়ন করে বাকী ইউরোপের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, যার প্রেক্ষাপটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। মাত্র ৬ বছরের শিল্প বিপ্লব পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্যকে জার্মানীর অনুকূলে নিয়ে এসেছিল এবং তাকে রুখতে পৃথিবীর বাদবাকি পরাশক্তিগুলোকে

একতাবদ্ধ হতে হয়েছিল। মাত্র ২০ বছরের শিল্পায়ন সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরবর্তী ৫০ বছর ধরে মার্কিন পরাশক্তির মোকাবেলায় সামর্থ্য যুগিয়েছিল। এই উদাহরণগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, যদি প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকে তাহলে যে কোন জাতি শিল্পোন্নত হতে পারে এবং নিজেকে রক্ষা করতে পারে। আর শিল্প ক্ষমতা না থাকলে প্রত্যেকটি জাতিকেই হতে হবে অন্য জাতির অনুগ্রহ নির্ভর।

তবে খিলাফতের শিল্প ক্ষমতা অর্জন আর এতক্ষণ ধরে আলোচিত জাতিগুলোর শিল্প ক্ষমতা অর্জনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। কুফর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিগুলো শিল্পায়ন ঘটিয়েছে অন্য জাতিকে পদানত করা, উপনিবেশ স্থাপন ও পরাশক্তি হওয়ার আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে।

অপরদিকে মুসলিম উম্মাহ্‌র শিল্প ক্ষমতা অর্জন ও প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধনের যে চেষ্টা, তার পেছনের চালিকা শক্তি ও প্রেরণা হলো ইসলামী আকীদা। আর মুসলমানদের সকল কর্ম পরিকল্পনা অবশ্যই হবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশ ও রাসূল (সাঃ) এর মহান বাণীর আলোকে আলোকিত।

"হে ঈমানদারগণ, যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এমন কোন কিছুর দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করেন যা তোমাদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করে তখন সেই আহ্বানে সাড়া দাও।" [সূরা আনফাল: ২৪]

প্রথম ড্রাফট

২৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩০ হিজরী
২৪ মে, ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দ